ইউনিট ১

ইতিহাস কি ও কেন, ভৌগোলিক অবস্থা ও তার প্রভাব, ইতিহাসের উৎস

ভূমিকা

যে কোন দেশের বা যুগের ইতিহাস পাঠ করার আগে জানা প্রয়োজন ইতিহাস কি, এর প্রকৃতি কিরূপ, পাঠ্য বিষয় হিসেবে এর ভূমিকাই বা কি। একই সাথে কোন নির্দিষ্ট কালের এবং নির্দিষ্ট দেশের ইতিহাস জানার পূর্বে জানতে হবে সমসাময়িক কালের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পরিবেশ। সমকালের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন গঠনে প্রাকৃতিক অবস্থা ও পরিবেশের ভূমিকা অনেকখানি। এজন্যই প্রয়োজন ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা নেয়া। সর্বোপরি যে সময়ের ইতিহাস চর্চা করা হবে তাকে জানতে হবে এবং তথ্য সূত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে। আর তা সম্ভব হতে পারে সমকালের ইতিহাসের উৎস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে।

পাঠ ১

ইতিহাসের সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ইতিহাস কি তা বলতে পারবেন।
- কি কি বিষয় নিয়ে ইতিহাস আলোচনা করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখতে হয়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ইতিহাস কি

ইতিহাস কি তা এক কথায় বলা কঠিন। কারণ অনেক পণ্ডিতই এ বিষয়ে নিজেদের মতো করে মত দিয়েছেন। তাই সহজেই একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পৌঁছা যায় না। তবে পণ্ডিতগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত সমূহ বিশ্লেষণ করলে একটি সাধারণ সংজ্ঞা তৈরি করা সম্ভব। আপনারা জানেন ইংরেজি 'History' শব্দেরই বাংলা অর্থ ইতিহাস। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর অনুসন্ধান বা গবেষণা।

> সাধারণ অর্থে ইতিহাস হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাস।

অতীতে যা কিছু ঘটেছে, - আমরা সাধারণভাবে তাকেই ইতিহাস বলি। কিন্তু অতীতের সব কিছুই কি জানা সম্ভব? শুধুমাত্র অতীতের যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী, মানুষের নির্মিত বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদি খুঁজে পাওয়া যায় বা লিখিত বিবরণ প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হয় তার ভিত্তিতেই তৈরি হয় ইতিহাস। এ কারণেই ইতিহাস চর্চায় প্রয়োজন অনুসন্ধান ও গবেষণা। শুধু মানুষ কেন- জীবজন্তু ও উদ্ভিদেরও অতীত আছে। তবুও সাধারণভাবে ইতিহাস হচ্ছে মানবজাতির কর্মকাণ্ড।

ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতামত

> অতীতের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করে তা লেখাকে ইতিহাস বলে।

এবার ইতিহাসের সংজ্ঞা নিরূপণে পণ্ডিতগণের মতামতের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। উপরে উল্লিখিত 'Historia' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস। হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। ইতিহাস বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন অতীতের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করে তা লেখা। হেরোডোটাস গল্পবলার ঢংয়ে ইতিহাস লিখেছিলেন। একই সময়ের গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডাইডিস একটু অন্যভাবে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তিনি অতীতের কাহিনী ও ঘটনা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাকেই ইতিহাস বলতে চেয়েছেন। তাঁর ইতিহাস রচনার ধারা ছিল বিজ্ঞান সম্মত। এ কারণে থুসিডাইডিসকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক বলা হয়। আবার থুসিডাইডিস মনে

করতেন অতীতের বর্ণনা থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। এ দৃষ্টিতে তাঁর ইতিহাস ছিল উপদেশমূলক। ফলে অনেকে থুসিডাইডিসকে উপদেশমূলক ইতিহাসের জনকও বলেছেন।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হেরোডোটাস ও থুসিডাইডিসের অনুসরণেই ইতিহাস লিখিত হতে থাকে। ইতিহাসের সংজ্ঞা আবার নতুনভাবে তৈরি হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। এসময়ের ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন ইতিহাস বিজ্ঞানেরই শাখা। কারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে যেমন পরীক্ষণাগারে প্রমাণ করতে হয়, ইতিহাস তৈরিতেও তেমনিভাবে প্রয়োজন প্রমাণের। কারণ অতীতের নানা উপাদান পরীক্ষা করে তবেই ঐতিহাসিককে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। এই মতের প্রধান প্রবর্তক ছিলেন জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোণ্ড ফন রাঙ্কে। তিনি মনে করেন কোন মতামত নয়- অতীতের ঘটনা হুবহু প্রকাশ করা হচ্ছে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব। এই ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এভাবে পুরনো ইতিহাস তথ্য সূত্রের আলোকে নতুন ভাবে লিখিত হতে থাকে।

অতীতের ঘটনা হুবহু প্রকাশ করা হচ্ছে ঐতিহাসিকের

কিন্তু রাঙ্কের ইতিহাসের ধারণাকে গ্রহণ করতে পারেননি ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. টি. বাক্‌ল। তিনি নতুন সংজ্ঞায় ইংল্যাণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস লেখেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। যদিও তিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লেখার পক্ষপাতি ছিলেন, তবুও রাঙ্কের চেয়ে তাঁর চিন্তা ছিল পৃথক। বাক্‌ল মনে করেন অতীতের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করলেই তা ইতিহাস হয় না। তাঁর মতে এসব ঘটনা তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্লেষণের পথ ধরে যাচাই করে নিলে তবেই তা হবে ইতিহাস।

এভাবেই ইতিহাসের সংজ্ঞা নতুন ভাবে রচিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক র‌্যাপসন বলেন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করাই হচ্ছে ইতিহাস। এই ধরণাই আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক হিল তাঁর মতে প্রাচীন দলিলপত্র পরীক্ষা করে রচিত মানব সমাজের অতীত কাহিনীই হচ্ছে ইতিহাস। খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ই, এইচ, কার মনে করেন অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র তৈরি করার বিদ্যাই হচ্ছে ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবির মতে মানব সমাজের ঘটনা প্রবাহই ইতিহাস। এই বক্তব্যের সাথেই সুর মিলেছে ভারতীয় ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের। তিনি ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ইতিহাস হচ্ছে মানব সমাজের অতীত কার্যাবলীর বিবরণী।

ঐতিহাসিক র‌্যাপসন বলেন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করাই হচ্ছে ইতিহাস।

এভাবে ঐতিহাসিকগণের বক্তব্যের আলোকে সংক্ষেপে বলা যায় অতীত উপাদানসমূহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের সমুদয় ঘটনার বিবরণই ইতিহাস।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় বেশ ব্যাপক। বলা যায় জীবন সৃষ্টির সূচনা থেকেই ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা আগেই লক্ষ করেছি অতীতের সব ঘটনার কাহিনীই ইতিহাস নয়। পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহই ইতিহাসে স্থান পায়। এই দৃষ্টিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মানুষের জীবনধারা, তার সমাজ ও পরিবেশ। এক কথায় মানুষের সভ্যতা। ঐতিহাসিক যেমন ঘটে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ করেন, তেমনিভাবে ঘটনার পেছনে থাকা প্রেক্ষাপট নিয়েও আলোচনা করেন। ইতিহাসের এই বিশ্লেষণ থেকেই প্রথম জানা সম্ভব হয় যে মানুষ জন্মগতভাবেই সংগ্রামী। বিরুদ্ধ পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে। এভাবেই মানুষ নিজেকে উন্নত সভ্যতা সৃষ্টিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। সংগ্রামের পথে মানুষের জয়যাত্রা ও পরাজয়, সব কিছু ইতিহাস-আলোচনার বিষয়বস্তু।

এই দৃষ্টিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মানুষের জীবনধারা, তার সমাজ ও পরিবেশ। এক কথায় মানুষের সভ্যতা।

মানুষের এই জীবন ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে আলোচনা করার সুযোগ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবেই চিহ্নিত হয়। যেমন- রাজনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিকতা আলোচনা করে লেখা হয় রাজনৈতিক ইতিহাস। একটি দেশের বা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তৈরি করা চলে অর্থনৈতিক ইতিহাস। আবার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে রচিত হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এই সমুদয় বিষয়বস্তুর আলোকেই সামগ্রিকভাবে রচিত হয় মানুষের ইতিহাস।

ইতিহাসের উপাদান

সমকালের মানুষের লিখে যাওয়া বিবরণ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উপরের আলোচনাসমূহ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করতে হয়। ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ও নানা রকমের। তবে অতীতের ছবি এভাবেই জানা যায় না। অতীতের মানুষের রেখে যাওয়া লেখনী ও নানা দ্রব্য সামগ্রী, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতির ভেতরেই লুকিয়ে থাকে ইতিহাস। তাই এ সমস্ত বস্তুকে বলা হয় ইতিহাসের উপাদান। এই উপাদানের উপর নির্ভর করেই লিখিত হয় ইতিহাস। সমকালের মানুষের লিখে যাওয়া বিবরণ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু সব সময় লিখিত উপাদান পাওয়া যায় না। মানুষ আদিকাল থেকে জীবন সংগ্রাম শুরু করলেও লিখতে শিখেছে অনেক পরে। আবার লিখতে জানলেও সকল অঞ্চলের মানুষ ইতিহাস সচেতন ছিল না। তাই ঘটনার বিবরণ সকলে লিখে যায়নি। ফলে ইতিহাস রচনায় অন্যসব উপাদনের উপর নির্ভর করতে হয়। এসব বিচারে ইতিহাসের উপাদানসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় - যেমন, লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান। সমকালিক সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, পর্যটকদের বিবরণী, সরকারি দলিলপত্র, রাজ রাজার জীবনী প্রভৃতি লিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। অলিখিত উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ধর্মীয় ও সাধারণ স্থাপত্য অর্থাৎ ইমারতসমূহ, বিভিন্ন ভাস্কর্য বা মূর্তি, মুদ্রা, তাম্রলিপি, শিলালিপি, মানুষের ব্যবহার্য তৈজস পত্র, চিত্রকলা প্রভৃতি। এভাবে লিখিত ও অলিখিত উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করেই রচনা করা হয়ে থাকে ইতিহাস।

সার-সংক্ষেপ

ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীর সাধারণ বর্ণনা নয় - বরঞ্চ তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবজীবনের অগ্রগতির বিবরণই ইতিহাস। মানবজীবন ও পরিবেশের নানা প্রসঙ্গ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। লিখিত ও অলিখিত নানা উপাদানের উপর নির্ভর করেই ইতিহাস লিখিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইতিহাস হচ্ছে–
- ক. অতীতের ঘটনার বর্ণনা।
- খ. রাজ রাজরার কাহিনী।
- গ. মানব জাতির ইতিহাস।

২। ইতিহাসের জনক–
- ক. হেরোডোটাস।
- খ. এইচ, টি, বাক্‌ল।
- গ. ই, এইচ, কার।

৩। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে–
- ক. অতীতের সব ঘটনার বর্ণনা।
- খ. অতীতের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণ।
- গ. মানুষের জীবনধারা, তার সমাজ ও পরিবেশ।

৪। ইতিহাস রচনা করতে হয়–
- ক. লিখিত উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে।
- খ. অলিখিত উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে।
- গ. লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ইতিহাস বলতে কি বুঝায়?

২. ইতিহাসের উপাদানসমূহ কি?

পাঠ ২

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মানব সমাজের ক্রমবিকাশের কাহিনী জানার জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে ইতিহাস কি ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বর্তমানকে বুঝার জন্য এবং ভবিষ্যৎকে গঠন করার জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশ

প্রথম পাঠ থেকে আপনারা জেনেছেন ইতিহাস হচ্ছে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের বিবরণ। ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়েই জানা যায় কিভাবে আদি মানব অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সভ্য ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। এভাবেই ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা মানব সমাজের শুরু থেকে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের সভ্যতা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, কিভাবে তার বিকাশ ঘটছে সবকিছুই জানা সম্ভব ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। ইতিহাস শুধু মানুষের অতীতকালের কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে না, মানুষের অতীত কর্মকান্ডের পেছনের উদ্দেশ্যও খুঁজে বেড়ায়। মানুষের অতীত কীর্তির পেছনের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করে। এভাবে, ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে অতীতকালে মানুষের চিন্তাভাবনা কি ছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা

ঐতিহ্য ও গৌরবের ইতিহাস থেকে একটি জাতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

একটি জাতির চেতনা জাগিয়ে তুলতে ইতিহাস পাঠ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কোন জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের ইতিহাস ঐ জাতিকে উৎসাহিত করে। ফলে, সে জাতির পক্ষে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কাজে উদ্দীপনা পাওয়া সহজ হয়। ঐতিহ্য ও গৌরবের ইতিহাস থেকে একটি জাতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ ধরনের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা সহজ হয়। আর এ থেকেই সহজ হয় দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা। একটি জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে ইতিহাস। তাই ইতিহাসজ্ঞান সমাজ ও জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠ মানুষের জাতীয় চেতনাবোধকে জাগিয়ে তোলে। সে তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান পায় ইতিহাসের পাতায়।

বর্তমানকে বুঝা ও ভবিষ্যৎ গঠনে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

কোন দেশের ইতিহাস পাঠে সে দেশের অতীতকেই শুধু জানা যায় না তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

বর্তমানকে বুঝার জন্য এবং ভবিষ্যৎকে গঠন করার জন্য অতীতকে জানা খুবই প্রয়োজন। এ কারণেই অতীতের প্রতি মানুষের এত কৌতূহল।তাই তো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাসের ভেতর। একইভাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে পাকিস্তানী শাসনামলে সংঘটিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের ভেতর। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার জন সিলী উল্লেখ করেছেন যে, কোন দেশের ইতিহাস পাঠে সে দেশের অতীতকেই শুধু জানা যায় না তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। তিনি তাই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার জন্যই ইতিহাস পড়া বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায় অতীতের মানুষ তাদের ভবিষ্যতের জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে আমরাও তাই করছি। বর্তমানের প্রতি যেমন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনি তাকে অতীত ও ভবিষ্যতের দাবিও পূরণ করতে হয়। অতীতের মানুষ কিভাবে এই সব দায়িত্ব পালন করেছে

ইতিহাস পাঠে তা জানা যায় এবং এই জ্ঞান বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাজে লাগানো যায়। এভাবে ইতিহাস অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টির সহায়ক হয়।

মানুষের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করে

এভাবে ইতিহাস পাঠ মানুষকে উদার করে এবং তার মনের দিগন্ত প্রসারিত হয়। আমরা জানি মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। বিচিত্র তাদের রীতিনীতি, আইনকানুন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও মনের ভেতর থেকে মানুষের মধ্যে একটি ঐক্যের বন্ধন রয়েছে। ইতিহাস পাঠ মানুষের এই বোধটিকেই জাগিয়ে তোলে। এভাবে মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

সার-সংক্ষেপ

মানব জীবনের প্রয়োজনে ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়েই মানব সমাজের ক্রমবিকাশের কাহিনী জানা যায়। নির্দিষ্ট জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অতীত ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায় বর্তমানকে এবং গঠন করা সম্ভব হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.২

নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন

১। ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায়–
ক. মানুষের অতীতকালের কর্মকাণ্ড।
খ. মানব সমাজের ক্রমবিকাশের কাহিনী।
গ. মানুষের চিন্তা ভাবনার কথা।

২। ইতিহাস বর্ণনা করে–
ক. মানব জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা।
খ. মানুষের চেতনা বোধের কথা।
গ. সমাজের অগ্রগতির কথা।

৩। ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন। কারণ–
ক. একটি জাতির ধর্মীয় আন্দোলনের কথা জানা যায়।
খ. বর্তমানকে বুঝা ও ভবিষ্যত গঠন করতে ভূমিকা রাখে।
গ. একটি জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মানব সমাজের ক্রমবিকাশের কাহিনী জানার জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করুন।
২. একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে ইতিহাস কি ভূমিকা রাখে?
৩. ‘ইতিহাস পাঠ মানুষের মনের দিগন্ত প্রসারিত করে’ - বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৩

উপমহাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ইতিহাসে একটি দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিবরন দিতে পারবেন।
- ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতের প্রধান অঞ্চলসমূহের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভারতবর্ষ

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

কোন দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়, যদি সে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় জানার সুযোগ থাকে। বর্তমান ইউনিটের প্রথম পাঠে আপনারা জেনেছেন ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ এবং তার সমাজ ও সভ্যতা। মানুষ একা তার সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে, তাকে সহযোগিতা করে চারপাশের প্রকৃতি। অর্থাৎ একজন বিখ্যাত ব্যক্তির ঘটনাবহুল কর্মময় জীবনের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ কোন না কোনভাবে তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অন্যদিক থেকে বলা যায়, একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ - এর সাধারণ অবস্থা, জলবায়ু, পাহাড়, পর্বত, উপকূলীয় অঞ্চল, নদী, রাজনৈতিক সীমান্ত ইত্যাদি সে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতি মানুষের জীবন ও চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত ভারতের ইতিহাসের গতিধারাও তার ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে, ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রকৃত রূপ বুঝতে হলে ভৌগোলিক অবস্থার নানা দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

> প্রকৃতি মানুষের জীবন ও চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান

প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। সাগর, পর্বত, বনভূমি, সমভূমি, মরুভূমি প্রভৃতির সমন্বয়ে ভারতবর্ষে একটি বহুধারার ভৌগোলিক অবস্থান গড়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে ভারতকে উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে। এর কারণ, ভারতের বিশাল আয়তন, প্রচুর জনসংখ্যা এবং তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। এশিয়া মহাদেশের মধ্য-দক্ষিণে ভারতের অবস্থান। এর উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় অবস্থিত। হিমালয় বিশাল প্রাচীরের মত যেন ভারতকে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। তাই, উত্তরাঞ্চল থেকে বহিরাগতরা সহজে ভারতে প্রবেশ করতে পারত না। উত্তর পশ্চিমে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুকুশ আর সোলেমান পর্বতমালা। ফলে, আফগানিস্তান, ইরান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতে আগমন ততটা সহজ ছিল না। আরাকান পর্বতমালা দাঁড়িয়েছিল উত্তর-পূর্ব দিকে। ফলে, মায়ানমার থেকে ভারত হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর ঘিরে রেখেছে উপমহাদেশটিকে। এজন্য কখনও কখনও ভারতকে বলা হয় একটি উপদ্বীপ। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের ভূ-খন্ড প্রায় ৩,২১৮ কি:মি: দীর্ঘ, আর ভারতের উপকূল রেখা ৪,৮২৭ কি:মি: বিস্তৃত।

> সাধারণভাবে ভারতকে উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে। এর কারণ, ভারতের বিশাল আয়তন, প্রচুর জনসংখ্যা এবং তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। এশিয়া মহাদেশের মধ্য-দক্ষিণে ভারতের অবস্থান।

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

উপরের আলোচনায় আপনারা বুঝতে পেরেছেন- প্রাকৃতিক অবস্থা বিচারে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশের বিকাশ ঘটেছে ভারতে। আপনারা জেনেছেন, ভারতে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরু, সুজলা-সুফলা ভূমি। এ কারণে, ভারতকে একটি ছোট পৃথিবীও বলা হয়ে থাকে। ভারতের এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিগত পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। জলবায়ু ও আবহাওয়া, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু প্রভৃতি বিচারে এই বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। হিমালয় অঞ্চলে যেমন রয়েছে শুষ্কতা ও প্রবল শীত, অন্যদিকে কঙ্কন ও করমন্ডল উপকূলে রয়েছে আর্দ্রতাযুক্ত গ্রীষ্ম মন্ডলীয় উষ্ণতা। এছাড়াও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে মরুভূমির আবহাওয়া, পরিমিত আবহাওয়া এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়া। বৃষ্টিপাতের দিক দিয়েও এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আসামের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে সিন্ধুদেশ ও রাজপুতনার কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা খুবই কম। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায়, - একইভাবে জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৈচিত্র্য।

ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতকে প্রধান ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা চলে–

১. উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল ঃ

তরাইয়ের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল থেকে হিমালয়ের চূড়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে যাওয়া ভূ-ভাগ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলীয় হিমালয় অঞ্চলের সমুদয় দেশই ছিল এর অন্তর্গত।

২. উত্তরের সমভূমি ঃ

উত্তর ভারতের আকৃতি অনেকটা চতুষ্কোণের মত। উত্তরের পর্বতমালা থেকে সিন্ধু ও গঙ্গা নামে দু'টো বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে। সিন্ধু অববাহিকাকে গঙ্গা থেকে পৃথক রেখেছে রাজস্থানের মরুভূমি এবং

কয়েকটি ক্ষুদ্র পাহাড়। উত্তরের সমভূমি বলতে দোয়াব অঞ্চলসহ দিল্লী থেকে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত গাঙ্গেয় সমভূমিকে বুঝায়। সুজলা-সুফলা বলে এই অঞ্চল পরিচিত 'ভারতের হৃৎপিন্ড' নামে। এই অঞ্চলটিই কোন এক সময় আর্যাবর্ত অর্থাৎ আর্যদের আবাসভূমি নামে পরিচিত হয়। গঙ্গা নদীর প্রবাহ এসেছে তিব্বত থেকে। আসাম উপত্যকা থেকে নদীটি প্রবাহিত হয়ে মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। এভাবেই নদীটি বাংলার দক্ষিণ দিকে সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। সাধারণভাবে বলা যায়, উত্তর ভারতের সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ পলিময় সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলেরই পশ্চিম অংশে রয়েছে আরাবল্লী নামে পৃথিবীর একটি বৃহত্তম পর্বত। এরই একটি শৃঙ্গ আবু পর্বত নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল এই অঞ্চলটি।

৩. মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঃ

উত্তর ভারতের দক্ষিণ থেকে ভারতের দক্ষিণ সীমায় কন্যাকুমারী বা কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এক বিশাল মালভূমির অবস্থান। পুরো অঞ্চলটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি মধ্য ভারতের মালভূমি ও অন্যটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। দন্ডকারণ্যের গহীণ বন রয়েছে মধ্য ভারতের মালভূমিতে। বিন্ধ্য ও কাইমূর পর্বত ভারতের মধ্য অংশ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে। বিন্ধ্য পর্বত অঞ্চলের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অবস্থিত। এর আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো। পর্বত বেষ্টন করে রেখেছে তিন দিক দিয়েই। এ কারণে অঞ্চলটিকে বলা হয় উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপই দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারত নামে পরিচিত।

৪. সুদূর দক্ষিণ এবং দ্বীপাঞ্চল ঃ

পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ ভূ-খন্ড সুদূর দক্ষিণ নামে পরিচিত। এখানে দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, দক্ষিণ দিকে এবং বাংলার দক্ষিণে রয়েছে বেশ কিছু দ্বীপ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আরব সাগরের লাক্ষা, মিনিকয়, মাল ও আমিন দিভি দ্বীপের সারি; আর বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিকে রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

এভাবে, বিভিন্ন বিভাজনের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

সার-সংক্ষেপ

ভারতের ইতিহাস আলোচনায় এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশাল ভারতভূমি ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফলে, ভারতকে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা চলে। আর এই বিভাজন থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব সম্পূর্ণ ভারতকে। উত্তরের নদী বিধৌত বিশাল সমভূমি আর দক্ষিণের মালভূমির মধ্যে অবস্থিত ভূ-খন্ডই হয়েছে ভারতের মানুষের প্রধান লীলা ক্ষেত্র, ইতিহাসের মঞ্চ। এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে গড়ে উঠেছে ইতিহাসের নিজস্ব ধারা। আবার ভারতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য দিয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোতধারা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। একটি দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা থাকলে–

ক. সেই দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়।

খ. সেই দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

গ. সেই দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

২। ভারত একটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ। কারণ–

ক. ভারত এশিয়া মহাদেশের মধ্য দক্ষিণে অবস্থিত।

খ. সাগর, পর্বত, বনভূমি, সমভূমি, মরুভূমি সব কিছুই ভারতবর্ষে রয়েছে।

গ. ভারতবর্ষে হিমালয় পর্বত রয়েছে।

৩. ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতকে বিভক্ত করা যায় প্রধানত–
ক. পাচঁটি অঞ্চলে।
খ. বারটি অঞ্চলে
গ. চারটি অঞ্চলে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ইতিহাসে একটি দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব কি, সংক্ষেপে লিখুন।
২. প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত কেমন ছিল - সংক্ষেপে লিখুন।
৩. ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা দিন।

পাঠ ৪

ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পাহাড় পর্বত, গিরিপথ ও মরুভূমি কিভাবে ইতিহাসে প্রভাব ফেলেছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নদ-নদী ও সমুদ্র কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কি ভূমিকা রেখেছে, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ভারতের নৌ-বাণিজ্য ও নৌ-শক্তি বিকাশে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতের ইতিহাসে আবহাওয়ার বিশেষ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বহিশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ করা যায়। আসলে ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। এর আগের পাঠে আপনারা ভারতের প্রাকৃতিক বিভাজন সম্পর্কে জেনেছেন। এবার আপনারা দেখবেন ভৌগোলিক এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভারতের ইতিহাসে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাহাড়-পর্বত, গিরিপথ, ও মরুভূমির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উত্তরে হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে বিশাল প্রাচীরের মতো। ফলে, বহিশত্রুর আক্রমণ সহজ ছিল না। ভারতের আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। কারণ, হিমালয়ের স-উচ্চ শিখরগুলো যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক ও শীতল বায়ুপ্রবাহ প্রবেশ করতে পারেনি ভারতে। ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর থেকে বয়ে আসা মৌসুমী বায়ু আছড়ে পড়ে হিমালয়ে। এর ফলে, এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয় থেকে জন্ম নেয়া নদ-নদীর পলিতে উর্বর হয় সমভূমি। এভাবে ভারতের উর্বর ভূ-খন্ডে সভ্যতার বিকাশ ঘটে। হিমালয় ছাড়াও বিন্ধ্য পর্বতমালা আড়াল করে রেখেছে দক্ষিণ ভারতকে। ফলে, স্বতন্ত্র ধারায় এখানে দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই পর্বত মালার বাঁধার কারণে উত্তর ভারতের সাথে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সুদৃঢ় হতে পারেনি। এভাবে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের প্রভাব মুক্ত থাকতে পেরেছে। ভারতের তিন পাশের সমুদ্র ও উত্তরের হিমালয় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করলেও বিদেশের সাথে যোগাযোগের কিছু সূত্র ছিল। এগুলো ছিল উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের গিরিপথ। এই গিরিপথগুলো যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। উত্তর পশ্চিমের খাইবার, গোমাল, বোলান প্রভৃতি গিরিপথ ধরে আর্য অভিযানকারী, মোঙ্গল প্রমুখ আক্রমণকারীগণ রাজ্য জয়ের জন্য ভারতে প্রবেশ করে। আবার এ পথ ধরেই ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগের কয়েকটি পথ রয়েছে। উত্তর-পূর্ব আসাম ও মায়ানমারের পর্বতমালায় রয়েছে কয়েকটি গিরিপথ। তিব্বতীয়, অহমিয়া ও বর্মীরা এই পথেই ভারতে প্রবেশ করে। তিব্বতে ও চীনে বিস্তৃত হয় ভারতীয় সভ্যতা। এই সব গিরিপথ ধরে ভারতীয় পন্ডিত ও চীনা পর্যটকগণ ধর্ম প্রচার ও বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাহাড়-পর্বত, গিরিপথ, ও মরুভূমির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সভ্যতা গড়ায় নদীর ভূমিকা

সভ্যতা গড়ে তোলায় নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ প্রধানত: নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। ভারতও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। বাণিজ্যের ও জীবন যাত্রার সুবিধার জন্য বন্দর ও জনপদ গড়ে উঠে নদীর তীরে। সিন্ধু নদের তীরেই বিকাশ ঘটেছিল মহেঞ্জোদারো নগরীর। ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা ২,৪২৭ কি:মি: দীর্ঘ। হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা প্রভৃতি নগর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। গঙ্গার উপনদী যমুনার তীরে গড়ে উঠেছে দিল্লী, মথুরা ও

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ প্রধানত: নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।

আগ্রা নগরী। ভাগিরথী গঙ্গার শাখানদী। এই নদীর তীরে গড়ে উঠে কলকাতা শহর। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোর তীরেও অনুরূপ নগর বন্দর গড়ে উঠে।

বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সমুদ্রের ভূমিকা

> সমুদ্র, ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে।

সমুদ্র, ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। আপনারা আগেই জেনেছেন, ভারত উপমহাদেশের তিন দিকে সমুদ্র। ফলে এখানে বহু বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র-বাণিজ্যেরও উন্নয়ন ঘটেছে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের গভীরতা কম। তাই এখানে খুব বেশি ভাল বন্দর গড়ে উঠেনি। অন্যদিকে পশ্চিম উপকূল খাড়া এবং সেখানে সমুদ্র বেশি গভীর। ফলে, এ অঞ্চলে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজের যাতায়াত ছিল সহজ। এ জন্য পশ্চিম উপকূলে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি বড় ও কতিপয় ছোট বন্দর। সমুদ্রের কাছাকাছি বাস করায় চোল, কেরল প্রমুখ প্রাচীন জাতি নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠে। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এই বাণিজ্য পথ ধরেই এক সময় ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রাধান্য পূর্ব ভারতের দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত হয়। আবার এই বাণিজ্য পথ ধরেই পরবর্তীকালে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হয় এ ভূ-ভাগে।

যোদ্ধা জাতির সৃষ্টি

> ভৌগোলিক কারণেই ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মানুষ যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

ভৌগোলিক কারণেই ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মানুষ যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পাহাড় ও বনাঞ্চলের মানুষ খুব সহজে জীবিকা অর্জন করতে পারতো না। কারণ, এই অঞ্চলের মাটি কৃষির জন্য তেমন উপযোগী ছিল না। তাই প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে এখানকার মানুষকে কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হতে হয়েছে। জীবন ধারণের প্রয়োজনে এরা প্রতিবেশী সমতল অঞ্চলগুলো আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতো। ভারতের এই যোদ্ধা জাতিদের বাস ছিল উত্তর পশ্চিমের পাহাড়ী অঞ্চল, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে। ক্রমে এরা স্বাধীনতা প্রিয় জাতিতে পরিণত হয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে মারাঠা ও রাজপুতগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত দিল্লীর শাসকদের কোণঠাসা করে রেখেছিল।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের বিকাশ

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি এং দাক্ষিনাত্যের মালভূমি, নদী উপত্যকা, পর্বতমালা প্রভৃতির কারণে দেশটি অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে মালোয়া, বুন্দেলখন্ড, অযোধ্যা, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, উত্তর গুজরাট, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলের নাম করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে এ সকল অঞ্চলের মানুষ ভাষাগত ও জাতিগতভাবেও আলাদা হয়ে পড়ে। এভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের জন্ম হয়। বাংলাকেও একটি প্রকৃতিক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা যায়।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিভার বিকাশ

> ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা অধিবাসীদের জীবন ও অভ্যাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা অধিবাসীদের জীবন ও অভ্যাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নদীর পলল ভূমিতে পর্যাপ্ত উৎপাদন, নৌ-পথে সহজ যোগাযোগ মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ করে তুলেছিল। সেই সাথে কোন কোন অঞ্চলে বছরের বিশেষ সময়ে অত্যধিক গরম বা তীব্র ঠান্ডার কারণে মানুষকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে হতো। এমনি করে বিভিন্নভাবে মানুষ কিছুটা অবসর পেয়ে যায়। অনেকেই এই অবকাশ সময় ব্যয় করে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে। ভারতের অঞ্চল বিশেষে চমৎকার চিত্রকলার বিকাশ ঘটে। এ সময় কেউ কেউ সৃষ্টিজগতের রহস্য নিয়ে ভাবতে থাকে। এভাবে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় আধ্যাত্মিক চেতনা। আর এরই পথ ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণার সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রবাণিজ্য বিকাশে ভূমিকা

ভারতের সমুদ্র উপকূল প্রায় ৬০০০ কি:মি: দীর্ঘ। এতো দীর্ঘ উপকূল থাকার পরও ভারতে তেমন উল্লেখযোগ্য নৌ-শক্তি গড়ে উঠেনি। কিন্তু নৌ-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে দ্রাবিড়রা সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক তৎপরতা প্রসারিত করে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে চুতর্দশ

শতাব্দী পর্যন্ত বাণিজ্য ও অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে অনেক ভারতীয় সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। ভারতের পূর্ব উপকূলের পোতাশ্রয় থেকে যাত্রা করে মায়ানমার, জাভা, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের রাজারা ভ্রমণকে উৎসাহিত করতেন। সুমদ্রপথ ভারতীয়দের শান্তিপূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করেছিল। ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক আগ্রাসন অথবা অর্থনৈতিক শোষণের ব্যাপারটি কখনও প্রাধান্য পায়নি। এ কারণে হয়তো শক্তিশালী নৌ-শক্তি গড়ে উঠেনি ভারতে।

সুমদ্রপথ ভারতীয়দের শান্তিপূর্ণ ভাবে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করেছিল।

পরিবেশের উপর আবহাওয়ার প্রভাব

পাহাড়, নদী এবং সমুদ্র উপকূলের মতো আবহাওয়াও ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় বেড়ে উঠা ভারতবাসী পর্বতবাসী শীত প্রধান অঞ্চলের রুক্ষ পরিশ্রমী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। আবহাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সুযোগ ছিল ভারতবর্ষে। ফলে, অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনধারণেও তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। আরব সাগর থেকে বয়ে আসা মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতের অনেক অঞ্চলেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সময় সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ায় ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে। যেমন, যদি ভারি বৃষ্টিপাত শুধু উত্তর প্রদেশ, বাংলা এবং বিহারেই হতো তবে এসমস্ত অঞ্চলই কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত ফসলে পূর্ণ থাকতো। অপরদিকে বৃষ্টিহীন রাজস্থান ও দক্ষিণাত্যে নিত্যদিন লেগে থাকতো খরা, অভাব, অনটন ও দুর্ভিক্ষ। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন এই অবস্থা থেকে রক্ষা করেছে ভারতকে। যেমন আজকের বৃষ্টিহীন অনুর্বর বেলুচিস্তানে এক সময় পর্যাপ্ত ফসল জন্মাত। খোটান অঞ্চলটি এখন বৃষ্টিহীন মরুময়। কিন্তু, নবম শতাব্দীর দিকে এখানে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আজ সিন্ধু বৃষ্টিহীন অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। অথচ এখানে এক সময় ছিল মানুষের ঘন বসতি। অনুকূল আবহাওয়ায় মাটি ছিল উর্বর। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া সীলগুলো থেকে ধারণা করা যায় এখানে এক সময় ষাঁড়, গন্ডার, জলহস্তী, বাঘ, হাতী প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করত। এ সমস্ত পশুর অধিকাংশই বসবাস করতো জলাসমৃদ্ধ বনে যার ছিটেফোটাও এখন সিন্ধুতে নেই।

পাহাড়, নদী এবং সমুদ্র উপকূলের মতো আবহাওয়াও ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় জানা যায়, মধ্যযুগের সিন্ধুর মরুভূমিতে প্রচুর মরুদ্যান ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে মূলতানে তৈমুর লং এর ঘোড়া হারিয়ে গিয়েছিল। খ্রী:পূ: ৩২৬ অব্দে বসন্ত ও গ্রীষ্মের শুরুতে ক্রমাগত ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে তক্ষশীলায় আলেকজান্ডারের আক্রমণ ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু, বর্তমানে এই অঞ্চলের আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

মধ্যযুগের সিন্ধুর মরুভূমিতে প্রচুর মরুদ্যান ছিল।

সার-সংক্ষেপ

যে কোন দেশের ইতিহাসে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রভাব ফেলে। এর প্রমাণ ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, নদ-নদী, সমুদ্র ঘিরে রেখেছে ভারতকে। ফলে, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের নানা প্রভাব মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এক কথায়, ভারতবাসীর জীবন অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসের অনেক সোপানই নিয়ন্ত্রণ করেছে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মৌসুমী বায়ুর কারণে ভারতে–

ক. অনেক পর্বতমালা গড়ে উঠে।

খ. মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু প্রবেশ করে।

গ. জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

২। ভারতের নদীসমূহ–
ক. জীবনযাত্রা সহজ করে।
খ. ব্যবসা-বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।
গ. সভ্যতা গড়ে তোলায় ভূমিকা রাখে।

৩। ভারতের বিশাল সমুদ্র উপকূল থাকায়–
ক. শক্তিশালী নৌ-শক্তি গড়ে উঠে।
খ. বিদেশে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
গ. সুমদ্র বাণিজ্য বিকাশ সম্ভব হয়।

৪। সময় সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন ভারতের–
ক. প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে।
খ. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেছে।
গ. দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. "ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাহাড়-পর্বত, গিরিপথ ও মরুভূমির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে"- ব্যাখ্যা করুন।
২. সভ্যতা গড়ায় নদীর ভূমিকা কি? সংক্ষেপে লিখুন।
৩. বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সমুদ্রের ভূমিকা- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. পরিবেশের উপর আবহাওয়ার কি প্রভাব রয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বৈদেশিক বিবরণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

বিশাল ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। তাদের রেখে যাওয়া প্রত্নসামগ্রী অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী তাদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

মুদ্রা

প্রাচীন ভারতে মুদ্রার পরিচয়

উপাদান হিসাবে মুদ্রার ভূমিকা

প্রাচীনকালে রাজারা ধাতুতে তৈরি মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। এগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান করে ও মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাচীন যুগের মুদ্রাগুলোর খুব অল্পই ছিল স্বর্ণ নির্মিত। তবে, তামা এবং রূপার মুদ্রাই পাওয়া গিয়েছে বেশি। সীসায় তৈরি কিছু মুদ্রার কথাও জানা যায়। তবে, কুষাণ যুগে তৈরি ছাঁচে ঢালা কিছু পোড়ামাটির মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। গুপ্ত যুগের পরে এই জাতীয় মুদ্রা আর পাওয়া যায়নি। প্রাচীন মুদ্রাগুলোতে বিভিন্ন প্রতীক খোদাই করা হতো। কিন্তু, পরবর্তীকালে মুদ্রায় রাজা ও দেবতাদের নাম এবং তারিখ খোদাই করা হয়। মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান থেকে ধারণা করা যায় রাজারা কতোদূর পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা প্রসারিত করেছিলেন। এভাবে ইতিহাস লেখায় মুদ্রা সহযোগিতা করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। তাই, মুদ্রা প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে ধারণা করা হয় সমসাময়িক কালের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল। মৌর্য যুগের পরবর্তীকালের প্রচুর মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এগুলো তৈরি হত সীসা, তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও সোনা দিয়ে। স্বর্ণমুদ্রা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় গুপ্ত আমলে। এতে অনুমান করা হয় গুপ্ত আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভাল ছিল। প্রাচীন মুদ্রায় অনেক সময় ধর্মীয় প্রতীক খোদাই করা হত। এ থেকে সে যুগের মানুষের শিল্প দক্ষতা ও ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে জানা সম্ভব।

শিলালিপি

শিলালিপির পরিচয়

উপাদান হিসেবে মুদ্রার চেয়ে শিলালিপির গুরুত্ব অনেকটা বেশি। সাধারণত পাথরের স্তম্ভে, তামার পাত্রে, মন্দিরের গায়ে, ইটের মধ্যে এবং মূর্তির গায়ে লিপি খোদাই করা হতো। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাথরের গায়ে লিপি খোদাই হতো। শিলালিপির ভাষায়ও বৈচিত্র্য রয়েছে। তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে খোদাই করা শিলালিপিগুলো ছিল প্রাকৃত ভাষায় লেখা। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রাকৃতের বদলে লিখিত হয় সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষা বেশ জনপ্রিয় হয়ে পড়ে চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে। নবম ও দশম খ্রিস্টাব্দ থেকে আঞ্চলিক ভাষায় শিলালিপি খোদিত হতে থাকে। হরপ্পাতে পাওয়া সীলমোহর ভারতের আদি শিলালিপি। পাঠোদ্ধার করা না গেলেও ধারণা করা হয় এগুলো খোদিত হয়েছিল ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বব্দে এলাহাবাদে প্রাপ্ত অশোক স্তম্ভেও গায়ে উৎকীর্ণ হরিষেন বর্ণিত-প্রশস্তি, যা এলাহাবাদ প্রশস্তি নামে খ্যাত, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উপাদান হিসাবে শিলালিপির ভূমিকা

বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য থাকে শিলালিপিগুলোতে। কোন কোন শিলালিপিতে সামাজিক, ধর্মীয় ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে রাজার আদেশ খোদাই করা হয়। সম্রাট অশোকের শিলালিপিগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লিপিগুলো খোদাই করা হতো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ধর্মের বাণী লিপিবদ্ধ করতো পাথরে বা মূর্তির গায়ে। তৃতীয় শ্রেণীর শিলালিপিগুলোতে রাজার যুদ্ধ জয় বা তার গুণের কথা লেখা থাকত। এছাড়াও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা জনকল্যাণে ভূমিদানের কথা লেখা থাকত শিলালিপিগুলোতে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ভূমিকা

প্রাচীনকালের বেশ কিছু স্তূপ, বিহার ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এসব থেকে ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করা চলে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা অনুমান করা চলে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা কেমন ছিল তাও জানা যায়।

ভাস্কর্য প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। মূলত: ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই মূর্তি গড়া হতো। মূর্তিগুলোর আকৃতি, দেহের গড়ন, পোশাক, অলঙ্কারের ব্যবহার থেকে সমকালীন মানুষের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। শুধু তাই নয় মূর্তি বিশ্লেষণ করে শিল্পীর দক্ষতা সমন্ধে ধারণা নেয়া সহজ হয়।

প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয়

হরপ্পায় পাওয়া সীলের গায়ে যে লিপির কথা এর আগে বলা হয়েছে তাতে বোঝা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের পূর্বে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ তথা ভারতের মানুষ লিখতে পারত। কিন্তু তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে লিখিত কোন কিছু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আর্যদের আগমনের পর ভারতে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এর সমস্ত লেখার মূল বিষয় ছিল ধর্ম। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণই প্রধান। এসব গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সমন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ধারণা করা হয় বিখ্যাত আর্য ধর্মগ্রন্থ 'ঋগবেদ' লেখা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে। এরপরে লেখা হতে থাকে সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ পরবর্তীকালে লেখা হয় রামায়ণ ও মহাভারত নামের দুইটি মহাকাব্য। এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরো অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল ভারতে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বিশেষ গুরত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছিল পালি ভাষায়। এইসব গ্রন্থ থেকে গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। জৈন গ্রন্থগুলো লিখিত হয়েছিল প্রাকৃত ভাষায়। এই গ্রন্থগুলো থেকে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে মহাবীরের আমলে যে রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সমসাময়িক কালের বাণিজ্য সম্পর্কেও জৈন গ্রন্থগুলোতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

আইনশাস্ত্র

অর্থশাস্ত্র প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচিত।

প্রাচীন ভারতে কিছু আইন বিষয়ক গ্রন্থও লিখিত হয়েছিল। এগুলোতে রাজা এবং কর্মচারীদের দায়িত্ব কর্তব্যের কথা লিখিত থাকতো। সম্পত্তির অধিকার এবং বিক্রয় সংক্রান্ত আইন কানুনও এখানে লিপিবদ্ধ থাকতো। বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির বিধান সম্পর্কেও এই আইনে তথ্য পাওয়া যায়। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন গ্রন্থ হিসাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থশাস্ত্র প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচিত। কৌটিল্য ছাড় ও ভাস, কালিদাস এবং বানভট্টের রচনায়ও ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। এঁদের গ্রন্থে সমকালীন ভারতের অনেক ছবি ফুটে উঠেছে।

পর্যটকদের বিবরণের গুরুত্ব

বিদেশী ধর্ম প্রচারক এবং পর্যটকদের বিবরণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে অনেক গ্রিক, রোমান ও চৈনিক পর্যটকগণ ভ্রমণ করেছেন। অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা। গ্রিক উপাদানের উপর নির্ভর করেই আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করা হয় পর্যটক মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মৌর্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। গ্রীক ও রোমানদের বিবরণীতে জানা যায় যে প্রাচীনকালে ভারত ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পর্যটক প্লিনির 'দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' এবং টলেমির 'জিওগ্রাফি' গ্রন্থ থেকে প্রাচীন

ভারতের ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে। বিশেষ করে গুপ্ত যুগের সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতির বিবরণ পাওয়া যায় ফা-হিয়েনের বর্ণনায়। আর হিউয়েন সাঙ এর বিবরণীতে পাওয়া যায় হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের বর্ণনা।

এসব ছাড়াও কিছু কিছু জীবনচরিতও লেখা হয়েছিল প্রাচীন ভারতে। যেমন বানভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত। কলহণের রাজতরঙ্গিনী প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চলের (কাশ্মিরের) ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সবের মধ্য দিয়ে সমকালের ইতিহাস লিখনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

সার-সংক্ষেপ

বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ থেকে ইতিহাস লিখিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখনে তিন ধারার উপাদান সহযোগিতা করেছে। এর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান; যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে মুদ্রা, শিলালিপি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য। দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে সাহিত্যিক উপাদান। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ধর্ম, সাহিত্য, আইন গ্রন্থ, জীবন-চরিত ইত্যাদি। আর তৃতীয় ধারার উপাদান হচ্ছে বৈদেশিক বিবরণসমূহ। যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো ধর্ম প্রচারক ও পর্যটকদের বিবরণ। এসব উপাদানের উপর ভিত্তি করেই লিখিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুদ্রা ও শিলালিপি হচ্ছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের–
- ক. সাহিত্যিক উপাদান।
- খ. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।
- গ. অর্থনৈতিক উপাদান।

২। ভাস্কর্য বিশ্লেষণ করে প্রধানত–
- ক. মূর্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।
- খ. শিল্পীর দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- গ. সমকালীন মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৩। ভারতে লিখিত সাহিত্য পাওয়া যায়–
- ক. হরপ্পায়।
- খ. আর্য আগমনের আগে।
- গ. আর্য আগমনের পরে।

৪। মেগাস্থিনিসের লেখা বইটির নাম–
- ক. ইন্ডিকা।
- খ. দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি।
- গ. জিওগ্রাফি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতে মুদ্রার পরিচয় দিন।
২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে শিলালিপির - গুরুত্ব লিখুন।
৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস হিসেবে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ভূমিকা তুলে ধরুন।
৪. ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থসমূহের গুরুত্ব লিখুন।
৫. ‘বিদেশী ধর্ম প্রচারক ও পর্যটকদের বিবরন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ন উপাদান’ - ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইতিহাসের সংজ্ঞা দিন। ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ইতিহাস কি এবং ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৩. ভৌগোলিক অবস্থা প্রাচীন ভারতের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন গঠনে কি ভূমিকা রেখেছে আলোচনা করুন।
৪. ইতিহাস থেকে একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কিভাবে জানা যায়? —বর্ণনা করুন।
৫. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভক্ত ভারতের প্রধান অঞ্চলসমূহের বর্ণনা দিন।
৬. ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব আলোচনা করুন।
৭. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভারতের নৌ-বাণিজ্য বিকাশে কিভাবে সহায়তা করেছে? —আলোচনা করুন।
৮. ইতিহাস কাকে বলে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের পরিচয় দিন।
৯. বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণসমূহের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ১.১	ঃ	১। গ	২। ক	৩। গ	৪। গ
পাঠ ১.২	ঃ	১। খ	২। ক	৩। খ	
পাঠ ১.৩	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ	
পাঠ ১.৪	ঃ	১। গ	২। গ	৩। গ	৪। ক
পাঠ ১.৫	ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	৪। ক